রাজশেখরের গীতাভাষ্য: 'নির্বর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টি'?

আশীষ লাহিড়ী

গীতা নিয়ে হিন্দু বাঙালিদের উচ্ছ্বাস যেমন প্রবল, তেমনি গীতা নিয়ে বাঙালি ভাবুকদের অস্বস্তির ইতিহাসটাও কিছু কম দীর্ঘ নয়। সুদূর ১৮৮৩ সালে অক্ষয় দত্ত লিখেছিলেন: 'ঐ প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য কি জান? জীবাত্মার ধ্বংস হয় না, অতএব যত ইচ্ছা নরহত্যা কর, তাহাতে কিছুমাত্র পাতক নাই।'[১] গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি এতখানিই যে ১৯০৯ সালে অজিত চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'আমাকে লজ্জার সাথে স্বীকার করতে হবে আমি আজ পর্যন্ত গীতা ভালো করে তলিয়ে পড়ি নি— দু তিনবার আরম্ভ করেছিলুম কিন্তু বাধা পেয়ে শেষ করতে পারিনি।' অস্বস্তির কারণ ব্যাখা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'গীতার মধ্যে কোনো একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে, তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে— কোনো একজন মহাপুরুষের বাক্যকে কোনো একটা সংকীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে যেরকমটি হয় গীতায় সেরকম একটা টানাটানি আছে। অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্যে আত্মার অনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতো করে টানাটানির একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও দেওয়ার চেষ্টা করেছেন: 'আমার মনে হয় বৌদ্ধ উপদেশে ভারতবর্ষকে যখন নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল— যখন অহিংসা ধর্মের সাত্ত্বিকতা কেবলমাত্র negative লক্ষণাক্রান্ত সুতরাং পূর্ণ সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল তখন কোনো একজন মনস্বী, পূর্বতন গুরুর উপদেশকে কর্ম্মোৎসাহকরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে থাকাতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব উচ্চভাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরী খানিকটা না মিশে পারেনি। গীতার সঙ্গে সঙ্গে সেই ইতিহাসটি যদি দেখতে পাওয়া যেত তাহলে বোঝবার পক্ষে ভারি সুবিধা হত।'[২]

১৯৪৮ সালে গিরীন্দ্রশেখর বসু 'গীতার অষ্টম অধ্যায়ের উত্তরায়ণে ও দক্ষিণায়ণে মৃত্যুর ফলবিভেদ সম্বন্ধে' লেখেন যে, 'যুক্তিবাদীর পক্ষে শ্লোকটির (৮/২৪-২৫) অর্থ বুঝিতে পারিলাম না বলাই সংগত।'[৩] মনোবিকলনবাদী গিরীন্দ্রশেখরের গীতা-বিশ্লেষণ

লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। ashis.lahiri@gmail.com।

রীতিমতো অভিনব, তা স্বতন্ত্র অভিনিবেশ দাবি করে। এখানে সে অবকাশ নেই, তবু খুব সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। তাঁর মতে গীতা সমেত যাবতীয় ভারতীয় দার্শনিক রচনার মূলে যত না আছে দার্শনিক জিজ্ঞাসা, তার চেয়ে বেশি আছে বিশেষ বিশেষ ঋষির বিশেষ বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার অবিকল, প্রসাধনহীন প্রক্ষেপণ। সেই কারণে অত্যন্ত প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টিময় উপলব্ধির পাশাপাশি দেখা যায় একেবারে হাস্যকর রকমের ছেলেমানুষির ('childish and even silly') সহাবস্থান। তাঁর মতে মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে দেখলে ভারতীয় দর্শনের অনেক দুর্বোধ্যতার কারণ ব্যাখ্যা সহজ হয়ে ওঠে। তিনি আরও বলছেন, গীতায় চার ধরনের ঈশ্বর-অন্বেষীর কথা বলা হয়েছে। ১) যারা বিপদ্‌গ্রস্ত; ২) যারা জ্ঞানপিপাসু; ৩) যাদের মধ্যে ধনসম্পদ আহরণের ও সুখভোগের প্রবল উচ্চাশা রয়েছে এবং ৪) যারা প্রজ্ঞাবান। প্রথম ধরনটি নিয়ে আলোচনা সহজবোধ্য কারণেই নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় ধরনের লোক সম্বন্ধে গিরীন্দ্রশেখর বলেছেন, শিশু যেমন তার নিরাপত্তার জন্য পিতার কাছে আশ্রয় খোঁজে, এঁরাও তেমনি ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় খোঁজেন। ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান তত্ত্বের অবতারণা করে তিনি বলেন, এটি শৈশবের অবচেতন নিরাপত্তা-কামী প্রবণতারই প্রাপ্তবয়স্ক প্রক্ষেপ মাত্র। এই ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন: 'এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে বলা যায় যে, ঈশ্বর আপন আদলে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এই তত্ত্বের বদলে বলা উচিত, মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে তার নিজের মনের ভেতরকার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে। ...'[৪] তৃতীয়, অর্থাৎ সম্পদপ্রিয় ও সুখান্বেষী ঈশ্বরভক্তদেরও তিনি মোটের ওপর এই গোত্রেই ফেলেন। তফাত এই, ভগবানের কাছে এরা শুধু আশ্রয়ই নয়, প্রশ্রয়ও চায়। এদের কাছে ঈশ্বর = বিশ্বপিতাঃ, যে-পিতার কাছে অসংকোচে যেকোনো আব্দার জানানো যেতে পারে। সেসব আব্দারের সঙ্গে বাস্তব-সম্ভাব্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। 'স্বর্গস্থ পিতঃ' পৃথিবীস্থ পিতারই অনেক বড়ো আকারের ছাঁদ বই আর কিছু নয়। যেহেতু সেটি আমাদের মনের নির্জ্ঞান প্রবণতারই এক প্রক্ষেপ মাত্র, তাই তা বাস্তবে কী সম্ভব আর কী-অসম্ভব তার মুখাপেক্ষী নয়। ফলে স্বর্গস্থ এই পিতঃ নানা রকম পরস্পর-বিরোধী গুণে ভূষিত, যেমন তিনি একই সঙ্গে "পরম কারুণিক" এবং "সর্বশক্তিমান"।[৫] এই পিতার কাছে চাইলেই যা খুশি জিনিস পাওয়া যায়, কেননা সর্বশক্তিমানের দেবার ক্ষমতা অসীম; অন্য দিকে পরম কারুণিক তিনি এতই স্নেহপ্রবণ যে আব্দার না-মেটালে তাঁর নিজেরই মন ভরে না: 'অসীম ধন তো আছে তোমার তাহে সাধ না মেটে। নিতে চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে।'

চতুর্থ বিভাগ, অর্থাৎ প্রজ্ঞাসন্ধানী যারা অন্বেষণের মারফত ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁছয়, তাদের সম্বন্ধে গিরীন্দ্রশেখরের বিশ্লেষণ আরও অভিনব। তাঁর মতে নিখাদ বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করার বাসনা ভগবৎ-অনুসন্ধানের একটি ন্যায্য তাড়না বলে গীতায় স্বীকৃত। বিভিন্ন উপনিষদ থেকে এই ধরণের ঈশ্বর-অনুসন্ধানেরর নানা উদাহরণ দিয়ে

তিনি দেখান যে, এর প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো প্রশ্ন তোলে, যথা: আমরা কোথা থেকে এলাম? কেমন করে আমরা জীবন ধারণ করি? মৃত্যুর পর কী হয়? কতকগুলি শক্তির ক্রিয়ায় জীবদেহ সজীব থাকে, এবং তার মধ্যে কোনটি মুখ্য? ঘুমের সময় কোন কোন ইন্দ্রিয় জেগে থাকে? স্বপ্নের উৎপত্তি কীভাবে হয়? শরীরের মধ্যে সুখানুভূতির আধার কোনটি? মনকে কে নিয়ন্ত্রণ করে? ইন্দ্রিয়গুলিকে সজীব করে রাখার ভার কার ওপর ন্যস্ত?' এইসব প্রশ্নের বেশির ভাগই হয় মনস্তত্ত্ব না হয় শারীরতত্ত্বের আওতায় পড়ছে; অল্প কয়েকটি পড়ছে পদার্থবিদ্যা ও দর্শনের আওতায়। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঋষিরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোনো প্রাক্‌নিরূপিত ধারণা নিয়ে ভাবনা শুরু করেন নি।....আর পাঁচজন নশ্বর মানুষের মতোই তাঁরা ওইসব সমস্যার ভারে পীড়িত ছিলেন।'[৬] গিরীন্দ্রশেখর এমনও বলেন যে, মনস্তত্ত্বের শিক্ষক হিসেবে তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকে ঠিক এই প্রশ্নগুলিই অনেক সময় পেয়েছেন। এই সব প্রশ্নের মধ্যে 'there is nothing of mysticism'। তবু যে এই সব প্রশ্নের উত্তর শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মের মতো এমন একটি ধোঁয়াটে সত্তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল, তার কারণ গিরীন্দ্রশেখর বলছেন, ওইটাই ছিল সেই প্রাক-বিজ্ঞান যুগে স্বাভাবিক। কারণ 'ঋষিরা প্রধানত চালিত হতেন তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক বোধের দ্বারাই, অর্থাৎ তাঁদের অপরিশোধিত নিজস্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা। নিউটন কিংবা আইনস্টাইনের লেখা পাঠ্যবই দেখে ঠিকভুল যাচিয়ে নেবার সুযোগ তাঁদের ছিল না।'[৭] ইঙ্গিতটা এই যে সে-সুযোগ থাকলে হয়তো ওরকম ধোঁয়াটে ধারণার প্রতি তাঁরা ধাবিত হতেন না।

তিনি কিন্তু এটা সেই প্রজ্ঞাসন্ধানীদের ন্যূনতা বলে আদৌ চিহ্নিত করছেন না। বরং এই কথাই বলছেন যে, তাঁরা অত্যন্ত সাহসভরে নিজেদের 'মনস্তাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞানের' ভিত্তিতেই অবরোহী (ডিডাক্‌টিভ) যুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেই যুক্তির সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ লোকের কাছে অবাস্তব মনে হল কি না হল তার পরোয়া করেননি।

একেবারে হালে অর্মত্য সেন গীতা প্রসঙ্গে কতকগুলো নীতিশাস্ত্রীয় প্রশ্নকে নতুন করে খুঁচিয়ে তুলেছেন তাঁর 'তার্কিক ভারতীয়' বইতে। অর্মত্য লিখেছেন: 'ভগবদ্‌গীতাতে আমরা দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত নৈতিক অবস্থানের সংঘাত দেখতে পাই। একদিকে কৃষ্ণ জোর দিচ্ছেন নির্ধারিত কর্তব্যপালনের ওপর, অন্যদিকে অর্জুন তুলে ধরছেন অশুভ পরিণতিকে এড়ানোর (ও শুভ ফলের জন্ম দেওয়ার) যুক্তিকে।...অর্জুন প্রশ্ন তোলেন, শুধুমাত্র একটি ন্যায়পূর্ণ আদর্শকে তুলে ধরার কর্তব্য সম্পর্কে যত্নবান হয়ে, সেই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সৃষ্টি আত্মীয়দের দুঃখ ও হত্যালীলা সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকাটা উচিত কিনা।' বিপরীতে, কৃষ্ণ অর্জুনকে জোর দিয়ে বলছেন, ফল সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে কর্তব্যে অবিচল থাকতে। কারণ এটি একটি ন্যায্য সংগ্রাম, এবং একজন ক্ষত্রিয় ও সেনাপতি হিসেবে অর্জুন তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।' সচরাচর ধরে-নেওয়া হয়, অর্জুন যে কৃষ্ণের অভিভাবন

মেনে নিয়েছিলেন, সেটা উচিত কাজই হয়েছিল। বস্তুত সেটাই গীতার সবচেয়ে বড়ো মাহাত্ম্য বলে সাধারণভাবে কীর্তিত। কিন্তু অমর্ত্য প্রশ্ন তোলেন: 'প্রকৃতপক্ষে, লড়াই ও বিরাট ধ্বংসলীলার পর যে ভয়াবহ জনশূন্যতা মহাভারতের শেষ দিকে, বিশেষত গাঙ্গেয় উপত্যকা এলাকাটিকে গ্রাস করেছিল, তাকে তো যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুনের সুগভীর দ্বিধার যথার্থতা হিসেবেও দেখা যেতে পারে। অর্জুন যে বিপরীত যুক্তিটি দিয়েছিলেন, যেটি বাস্তবিকই খণ্ডিত হয়নি।'[৮] অর্থাৎ বড়ো প্রেক্ষিতে দেখলে কৃষ্ণ নয়, অর্জুনের যুক্তিই জয়ী!

রাজশেখরের গীতাভাষ্য

বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ক্ষেত্রচারী বাঙালিদের সংশয়বাদী গীতা-বিশ্লেষণের এই ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে রাজশেখর বসুর গীতাভাষ্য নিয়ে একটু আলোচনা করলে মন্দ হয় না। রাজশেখর মোটের ওপর সংশয়বাদী ঘরানারই লোক। তিনি যে বাঁধা গতে গীতা ব্যাখ্যা করবেন না, সেটা ধরেই নেওয়া যেতে পারে। সুনীতিকুমারের ভাষায়, রাজশেখর রামায়ণ ও মহাভারতকে 'বিশেষ কোনও আস্থাভেদের রঙিন কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন নি। এই নির্বর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টির মূল্য এ যুগের মানুষ-মাত্র স্বীকার করবেন...।'[৯] বাস্তবিক, তাঁর অনূদিত মহাভারতের ভূমিকায় রাজশেখর 'গীতাধর্মব্যাখ্যাতা' কৃষ্ণ সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করেছেন, তা থেকে এ কথাই ঠিক বলে মনে হয়: 'মাঝে মাঝে তাঁর (কৃষ্ণের) যে বিকার দেখা যায় তা ধর্মসংস্থাপক পুরুষোত্তমের পক্ষে নিতান্ত অশোভন, যেমন ঘটোৎকচ বধের পর তাঁর উদ্দাম নৃত্য এবং দ্রোণবধের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের উপদেশ।' তিনি এও দেখিয়েছেন যে, 'কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্যোধনের জামাতা; দুর্যোধন তাঁর বৈবাহিককে ঈশ্বর মনে করতেন না।'[১০] এমনকি বিশ্বরূপ দেখিয়েও কৃষ্ণ দুর্যোধনের মনে সে-বিশ্বাস জাগাতে পারেননি। তবু, রাজশেখরের দৃষ্টি সত্যিই কতটা 'নির্বর্ণ' ছিল, সে বিষয়ে আমাদের কিছু সংশয় জেগেছে, (অবশ্য 'নির্বর্ণ' দৃষ্টি বলে আদপেই কোনো কিছু হয় কি না, সে প্রশ্নটা আপাতত মুলতুবি রাখছি)।

তাঁর গীতার অনুবাদটি ১৯৪৮ সালের আগে রচিত হয়েছিল, ঠিক কোন সালে জানতে পারিনি (জানবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি বললে অবশ্য মিথ্যে বলা হবে)। হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত 'রাজশেখর গ্রন্থাবলী' প্রথম খণ্ড (এম সি সরকার, 'জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ', ১৯৮০) গীতার অনুবাদটি সন্নিবিষ্ট আছে, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় এর রচনা-কালটি উল্লেখ করেন নি। তবে তাঁর লেখা ভূমিকার একটি পরোক্ষ মন্তব্য থেকে এর রচনাকাল সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করতে পারছি। হরপ্রসাদ জানিয়েছেন, 'সহোদর গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'ভগবদ্‌গীতা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩৫৫, অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৪৮ সালে এবং 'গিরীন্দ্রশেখর রাজশেখরের অনুবাদ থেকে অনেক সাহায্য পান'।[১১] সুতরাং রাজশেখর অনুবাদটি অন্তত ১৯৪৮ সালের আগে করেছিলেন, কিন্তু জীবদ্দশায় সেটি প্রকাশ করেননি। বস্তুত তাঁর অনুবাদের পাণ্ডুলিপির ওপর স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল, প্রকাশের জন্য নয়।

জীবনযাপনের পথপ্রদর্শক

রাজশেখর বসু গীতাকে প্রধানত ব্যবহারিক জীবনের পথ-প্রদর্শক বলেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এর দার্শনিক গুরুত্ব তাঁর কাছে তুলনামূলকভাবে কম। ভূমিকায় লিখেছেন:

> গীতাতে দার্শনিক তত্ত্ব বিস্তর আছে, তথাপি এতে মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যাই কথিত হয়েছে। (গীতাকারের) প্রধান উদ্দেশ্য— ঐ সকল তত্ত্ব অনুসারে *জীবনযাত্রার পদ্ধতি* নির্ধারণ।

হিন্দুধর্মের কোনো ক্রীড না থাকলেও এককভাবে কোনো একটি গ্রন্থকে যদি তার কাছাকাছি মর্যাদা দেওয়া যায়, সেটি নিঃসন্দেহে গীতা। আধুনিক হিন্দুদের ইহকাল-পরকালের সঙ্গে গীতাকে জড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস খুবই ব্যাপক। রাজশেখর সে প্রয়াসের বিরোধী। তবে কি গীতা তাঁর কাছে নিছক এথিক্স, শুধুই পরিকল্পিত নীতিশাস্ত্র? না,তাও নয়—

> গীতা কেবল নীতিশাস্ত্র বা ethics নয়। নীতিশাস্ত্র বলে— এই কাজ ভাল, এই কাজ মন্দ, বড় জোর বলে— এইজন্য ভাল, ওইজন্য মন্দ। কিন্তু গীতাকার অধিকন্তু বলেন— *এইরূপে জীবন নিরূপিত কর*, তবেই যা শ্রেয় তাতে মন বসবে, যা হেয় তাতে বিরাগ জন্মাবে।[১২]

তাঁর বক্তব্য, গীতায় কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, তা তো বলাই হয়েছে, উপরন্তু কার্যক্ষেত্রে কীভাবে জীবন নির্বাহ করলে ভাল হবে, সে ব্যাপারেও পালনযোগ্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু জীবন নির্বাহ করার পদ্ধতির কথা বললেই প্রশ্ন উঠবে: কার জীবন? শূদ্রের না ব্রাহ্মণের, বৈশ্যের না ক্ষত্রিয়ের? সবার জীবন তো এক খাতে বইবে না, কারো কারো মধ্যে তো খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। রাজশেখর এই সামাজিক উচ্চাবচতার ব্যাপারটা নিয়ে সচেতন ছিলেন। নইলে এ কথা কেন বলবেন যে 'গীতা সর্বসাধারণের জন্য রচিত হয়নি'?[১৩] আত্মপক্ষ সমর্থনে গীতার একটি বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি বলছেন—

> এই গীতোক্ত ধর্ম তোমার কদাচ তপস্যাহীনকে বক্তব্য নয়, অভক্তকে নয়, অশ্রবেণচ্ছুকে নয়, যে আমাকে [= কৃষ্ণকে] অসূয়া করে তাকেও নয়। কাম্য কর্মে আসক্ত বিষয়সেবী অজ্ঞ-লোকের বুদ্ধিভেদ করতে গীতাকার নিষেধ করেছেন।[১৪]

তাঁর মনে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই যে, গীতার শিক্ষা সমাজের সর্বজনের জন্যে নয়, বাছাই করা কিছু লোকের জন্য:

> গীতার উপদেশ— জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ আচরণ দ্বারা সামাজিক আদর্শ রক্ষা করবেন, যাতে জনসাধারণ একটা সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগম মার্গ অনুসরণ করতে পারে।[১৫]

সমাজে একদল জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন। তাঁরা নিজ আচরণ দ্বারা একটা আদর্শ রক্ষা করবেন। আর সেই আদর্শ নির্বিবাদে মেনে চলবেন সমাজের বাকি অংশ— জনসাধারণ। শুধু মেনে

চলবেন নয়, সেই চলার মার্গটি নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ, এ দিক ও দিক হওয়ার জো নেই। সে পথ সুগম করে তোলাই জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের কাজ। যে-পথ দেখানো হবে তা থেকে বিচলনের, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকবে না। হয়তো বিচলন শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং গীতা খুব সচেতনভাবেই সমাজ-পরিচালকদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে রচিত, এই হল রাজশেখরের কথার তাৎপর্য।

শুধু স্বার্থ রক্ষাই নয়, কেউ সে-স্বার্থ বিঘ্নিত করলে তাকে নিরস্ত করার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল গীতার মধ্যে—

> বিষয়াসক্ত অজ্ঞলোকের বুদ্ধিভেদ করলে কুতার্কিক সমাজদ্রোহীর উদ্ভব হবে এই আশঙ্কা গীতাকারের ছিল।[১৬]

কোন্ সমাজদ্রোহ সুতর্ক-ভিত্তিক, আর কোনটা কুতর্ক-ভিত্তিক, সে বিচার কে করবে, এ প্রশ্ন অবশ্য রাজশেখর তোলেননি (এ প্রশ্ন না-তোলাটা অবশ্যই এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক, সে প্রসঙ্গে একটু পরেই আসছি)। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা জানি, যেকোনো সমাজেই যেসব তর্ক সমাজপ্রভুদের কর্তৃত্ব নিয়ে, অথবা সমাজের স্থিতাবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, সেইগুলোই কুতর্ক বলে বিবেচিত হয়। তিনি ধরেই নিয়েছেন, সেইসব কুতর্ককে কীভাবে নিরস্ত করতে হবে, তার পথনির্দেশনাই গীতার মর্মবস্তু। কোনোরকম সমাজদ্রোহকে প্রশ্রয় না দেওয়ার দর্শনই গীতার দর্শন। নীতিশাস্ত্র বলতে এখানে পরিষ্কারভাবেই সেই নীতিশাস্ত্র বোঝানো হচ্ছে, যা সমাজশাসকদের অনুকূল। সমাজ বলতে এখানে সমাজ-পরিচালকদের গোষ্ঠীকেই বোঝানো হচ্ছে, যেমন প্রাচীন গ্রীসে গণতন্ত্র বলতে দাস-মালিকদের গণতন্ত্র বোঝনো হত। সমাজের সকল মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল আদৌ তার বিবেচ্য নয়, তার বিবেচ্য হল সমাজের 'শান্তি', অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বৈষম্যভিত্তিক ভারসাম্য।

কিন্তু তাই যদি হবে, তা হলে গীতার বাংলা অনুবাদ করে তার বাণী সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ কি অভিপ্রেত? এইখানে রাজশেখরের দোটানা ধরা পড়ে যায়। প্রথমত তিনি স্বীকার করেন:

> বর্তমান কালে (অন্তত ১৯৪৮ সালে) গীতা সম্বন্ধে এই সতর্কতা অবলম্বন করা অসম্ভব।[১৭]

তার অর্থ হল, সেই সতর্কতা পূর্বকালে অবলম্বন করা সম্ভব ছিল এবং সেটাই করা উচিত ছিল। গীতার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল সমাজের পরিচালক মহলেই। কারণ, গীতার বহু যুক্তিই শাঁখের করাত, তা দুদিকেই কাটে। যারা পরিচালিত, তারা যদি গীতার যুক্তিতে বলীয়ান হয়ে পরিচালকদের মারতে আরম্ভ করে, এবং বলে যে আত্মা তো মরে না, সুতরাং তোমাদের মারলে কোনো অন্যায় নেই, তা হলে সেটা গীতাকারের মতে ঠিক নয়। যুক্তি যা কিছু সব এক পক্ষেই থাকুক, এই তাঁর বাসনা। তাই ওই 'সতর্কতা'। কিন্তু গণতান্ত্রিক যুগে, যখন স্বাধীন চিন্তার সর্বজনীন অধিকার ব্যাপকভাবে স্বীকৃত, অন্তত মুখে স্বীকৃত, তখন

সেই সতর্কতা আর তো অবলম্বন করা সম্ভব নয়। রাজশেখর তাই বাধ্য হয়েই মেনে নেন যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সকলেই ইচ্ছে করলেই আজ গীতা পড়তে পারে। কিন্তু তাই বলে তিনি যে স্বাধীন চিন্তার সর্বজনীন অধিকারের মস্ত প্রবক্তা তা মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ উদ্ধৃত অংশটির ঠিক পরের কটি শব্দ এইরকম:

> কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে, আপামর জনগণকে গীতা মুখস্থ করিয়ে কোনও লাভ নেই।[১৮]

কেন লাভ নেই? কারণ, জনসাধারণ ওর মর্ম উদ্ধার করতে পারবে না। ওখানে যেসব মূল্যবোধ ও উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে, তা সম্যক বুঝতে পারবে না। বোঝবার খুব প্রয়োজন আছে বলেও তিনি মনে করেন না।

এইখানে তাঁর চিন্তার দোদুল্যমানতা। এক দিকে তিনি বলছেন, গীতা শুধু ভালোমন্দ-নির্দেশক নীতিশাস্ত্রই নয়, সেই নীতিকে জীবনে সদর্থকভাবে প্রয়োগ করার উপায়-নির্দেশকও বটে: অন্য দিকে বলছেন, সেই পথ জনগণকে শিখিয়ে কোনো লাভ নেই! তার অর্থ কি তা হলে এই দাঁড়াল না যে, সমাজের ভালোমন্দ, নিজের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামানো আপামর জনগণের কাজ নয়, তাদের কাজ কেবল নির্বিচারে জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা মেনে চলা? জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভুল করলে তা নিয়ে প্রশ্ন করা বারণ, কেননা তা হলেই সেটা কুতর্ক এবং সমাজদ্রোহ বলে গণ্য হবে। এখানে গণতান্ত্রিক সমাজের একটি একেবারে বুনিয়াদি ভাবনার বিরোধিতা করছেন রাজশেখর।

ব্যাপারটা তিনি সমর্থন করছেন এই যুক্তিতে যে—

> চিকিৎসকের ব্যবহৃত ঔষধের গুণাগুণ বুঝে নিয়ে তারপর ঔষধ সেবন করা সকল রোগীর সাধ্য নয়। চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা বা ভক্তির বশেই সাধারণ রোগী ঔষধ সেবন করে। ব্যবস্থার কারণ যে বুঝতে চায় তারও শ্রদ্ধা ও 'অনসূয়া' আবশ্যক, নতুবা বোঝবার সামর্থ্যই আসবে না।[১৯]

ওষুধের দোষগুণ বোঝা সকল রোগীর সাধ্য কি না, সেটা পরের প্রশ্ন। আগের কথা হল, রোগীর সে অধিকার আছে কি না। আধুনিক মেডিক্যাল এথিক্স ও মানবাধিকার বলছে, সকল রোগীর সেই অধিকার আছে। ঔষধের বা চিকিৎসার গুণাগুণ— বিশেষ করে অগুণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাটা 'সাধারণ', অর্থাৎ অবিশেষজ্ঞ রোগীর অধিকার বলে গণ্য। উন্নত বুর্জোয়া দেশের চিকিৎসকরা ভালো করেই জানেন যে, ওষুধের বা চিকিৎসার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে রোগীকে সম্যক অবহিত করাটা আজ চিকিৎসকের কর্তব্য বলে মান্য। বরং 'ভক্তিশ্রদ্ধা'-বশত চিকিৎসকের কাছে জানতে না-চাওয়াটাই আজ মূঢ়তা বলে গণ্য। এমনকী বহু ক্ষেত্রে চিকিৎসা বেছে নেওয়ার অধিকারও রোগীর রয়েছে। সাধারণ বা অবিশেষজ্ঞ মানুষের মূঢ়তা সম্বন্ধে এলিটিস্ট অবজ্ঞা অভিজাততান্ত্রিক সমাজের প্রবক্তার মুখেই মানায়, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজে তা অচল।

এমন নয় যে অকাট্য বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধাই রাজশেখরকে ওই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছে। কেননা গীতাকারের কেজো বিচক্ষণতার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন:

> তৎকালপ্রচলিত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের উপর গীতাকারের শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু নিম্ন অধিকারীর পক্ষে এসকল কর্ম তিনি হিতকর বলেই মনে করেন। শ্রেষ্ঠ সাধকের পক্ষেও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বর্জনীয় বলা হয়নি, কারণ তাতে ইতর সাধারণের আদর্শ-বিপর্যয়ের সম্ভাবনা।[২৩]

তার মানে, ইতর সাধারণের আদর্শ-বিপর্যয় রুখবার জন্য গীতাকার স্বয়ং নিজের বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কথা প্রচার করছেন। সত্যের আপসহীন অনুসন্ধান বা অনুসরণ তাঁর লক্ষ্য নয়, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কৌশল অবলম্বনই তাঁর অন্বিষ্ট। কথাটি ভালো করে বোঝা দরকার। সমাজের মাথারা যে সব অনুষ্ঠান পালন করে, সেগুলো যে মিথ্যা, প্রতারণামূলক, সে কথাটা ইতর সাধারণ একবার বুঝতে পারলে তারা প্রথমত ওই সব অনুষ্ঠানাদি পালন করবে না, দ্বিতীয়ত সমাজপ্রভুদের অভ্রান্ত বলে মানবে না, তৃতীয়ত নিজেদের মানবিক অধিকার দাবি করে বসে সমাজের স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করবে। সুতরাং গীতাকারের কাছে সত্য-মিথ্যার আলাদা কোনো তাৎপর্য নেই, কোন কথাটা সমাজ-পরিচালকদের স্বার্থ-সহায়ক, সেটুকুই বিচার্য। গীতার সঙ্কীর্ণ, কেজো উপযোগিতাকে এইভাবে অনুমোদন দিয়ে রাজশেখর কার্যত ওই জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের দার্শনিক মর্যাদা অনেকখানিই কেড়ে নিলেন। অমর্ত্য সেনের মতো তিনি কিন্তু গীতার এই ভূমিকার সমালোচনা করছেন না, বরং ওই ভূমিকাটিকেই কাম্য বলে সমর্থন করছেন।

দ্বৈত মান

এইখানেই খটকা লাগে। বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির অন্যতম শ্রদ্ধেয় প্রবক্তা রাজশেখরের কাছ থেকে এটা যেন আমরা আশা করি না। কেননা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর ক্ষেত্রে তিনি এক নৈর্ব্যক্তিক অলঙ্ঘনীয়তার কথা বলছেন: 'বিজ্ঞানও স্বীকার করে— এই জগৎ নিয়তির রাজ্য, সমস্ত ঘটনা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত অখণ্ডনীয়রূপে নিয়ন্ত্রিত।' এমনকী আদি অর্থে অদৃষ্ট আর নিয়তির পার্থক্য কী, তার অনবদ্য ব্যাখ্যা দেন:

> নিয়তির অর্থ— সমস্ত ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ বা আনুপূর্ব।...কতকগুলি জাগতিক ব্যাপার আমাদের বোধ্য বা সাধ্য, কিন্তু অধিকাংশই অবোধ্য বা অসাধ্য।
>
> প্রথমোক্ত বিষয়গুলি আমাদের 'দৃষ্ট' অর্থাৎ নির্ণেয়, শেষোক্ত বিষযগুলি 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অনির্ণেয়। যাহা দৃষ্ট, তাহাতে আমাদের কিছু হাত আছে, যাহা অদৃষ্ট তাহাতে মোটেই হাত নাই।"

প্রাকৃতিক নিয়মাবলি অনুধাবনের মানদণ্ড তাঁর কাছে একটাই, অনেক নয়। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে তিনি একেবারে বিপরীত অবস্থান বেছে নিচ্ছেন। স্বীকার করছেন, এক

এক অংশের জন্য এক একরকম নিয়ম প্রযোজ্য। গুণভিত্তিক বর্ণবিভাগ থেকে জাতিভিত্তিক বর্ণবিভাগ ও কর্মবিভাগ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে তিনি স্পষ্টই বোঝান, গীতায় যে অর্থে স্বধর্মের কথা বলা হয়েছে, তার দিন ফুরিয়েছে, আধুনিক যুগে তা অর্থহীন।

> কোনো এক কালে ভারতবর্ষে গুণকর্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ হত, কিন্তু পরে বর্ণ, বৃত্তি ও ধর্ম জাতিগত হয়ে যায়।... সমাজের অধিকাংশ লোকই বর্ণগত ধর্মপালন করত। গীতায় স্বধর্ম শব্দের স্পষ্ট অর্থ— স্বীয় বর্ণের নির্দিষ্ট ধর্ম।[২২]

একালের কোনো আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মনের পক্ষেই এই সঙ্কীর্ণতাকে নৈতিকতা-সম্মত বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। রাজশেখরও এই প্রশ্নে বেশ বিচলিত। তিনি 'গীতাযুগের সামাজিক অবস্থা'র বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে ওই ঘটনাটিকে বিচার করতে বলেন। অর্থাৎ তিনি মেনে নেন, ওই ধারণা যুগোত্তীর্ণ নয়, কেবল ওই বিশেষ যুগের পটভূমিতেই বিচার্য:

> গীতাযুগের সামাজিক অবস্থা কল্পনা করলে এই অর্থ সংকীর্ণ বোধ হবে না। তখনকার শিক্ষার ধারা বর্ণ ও বংশগত ছিল; যে লোক যে বর্ণে জন্মাত সেই বর্ণের নির্দিষ্ট আচরণই তার পক্ষে সুসাধ্য এবং স্বভাবের অনুকূল হত।[২৩]

তিনি কিন্তু মানেন যে

> বর্তমান কালে বর্ণগত ধর্ম লোপ পেয়েছে, সেজন্য 'স্বধর্মের' প্রাচীন অর্থ ধরলে গীতার অর্থ নিরর্থক হয়। এখনকার সমাজে বর্ণগত কর্মভেদ নেই, গুণকর্ম অনুসারেও বর্ণভেদ নেই। ধর্ম পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু নূতন ধর্মশাস্ত্র লিখিত হয়নি। এখন নিজের শিক্ষা, প্রতিবেশ এবং স্বভাব বা রুচির অনুকূল ধর্মই স্বধর্ম।[২৪]

তাই যদি হয়, অর্থাৎ এ যুগে শ্রেণি ও বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তিমানুষের যদি আপন আপন শিক্ষা, প্রতিবেশ, স্বভাব এবং রুচির অনুকূল কাজ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকে, সে-স্বাধীনতা যদি সমাজ-স্বীকৃত হয়, তাহলে ইতর সাধারণের আদর্শ-বিপর্যয়ের এবং কুতর্কভিত্তিক সমাজদ্রোহের আশঙ্কা দূর করার উপযোগী শাস্ত্র হিসেবে গীতার গুণকীর্তনের কোনো যুক্তি থাকে কি?

আধুনিক মানুষের কাছে গীতার অন্য অনেক অনুপযোগিতার কথা তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেন—

> গীতায় বহু প্রসঙ্গ আছে যা অনেক আধুনিক পাঠকের ধারণার বিরোধী। জন্মান্তরবাদ, দেশ থেকে উৎক্রান্ত সূক্ষ্মশরীর (১৫।৮), দেবযান, পিতৃযান (৯।২৫) প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব, এমনকি তাঁর ঐতিহাসিকত্ব অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হতে পারে।[২৭]

গীতা সম্বন্ধে রাজশেখরের উপলব্ধির জায়গাগুলি পরপর সাজালে এইরকম দাঁড়ায়: গীতা ১) সর্বসাধারণের উদ্দেশে রচিত নয়, বিশেষ এক শ্রেণির মানুষের জন্য রচিত। 'আপামর জনগণকে গীতা মুখস্থ করিয়ে কোনও লাভ নেই।' ২) এর উদ্দেশ্য হল ইতর

সাধারণের আদর্শ-বিপর্যয়ের এবং কুতর্কভিত্তিক সমাজদ্রোহের আশঙ্কা নিরস্ত করার পথ দেখানো। মানুষ নিজের মতো ভাবতে শিখুক, এটা গীতাকারের কাম্য নয়। ৩) স্বধর্ম, যা গীতায় ব্যাখ্যাত ধারণাগুলির মধ্যে প্রধান, তা ওই বিশেষে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থময় হলেও, আধুনিক পরিবেশে তা অর্থ হারিয়েছে, কেননা এখন ব্যক্তিমানুষের নিজের শিক্ষা, প্রতিবেশ, স্বভাব ও রুচির অনুকূল ধর্মই স্বধর্ম। ৪) সেই অর্থে গীতা যুগোত্তীর্ণ নয়, তার মহিমা তার নিজ কালের উপযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ৫) সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে তা অত্যন্ত উপযোগী ছিল। সেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য নিজ বিশ্বাসবিরোধী কূটকৌশল, যে-ধারণা তাঁর নিজের মতেই মিথ্যা, তা প্রচার করতে গীতাকারের বিবেক দষ্ট হয়নি। অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা গীতার প্রধান গুণ নয়। কোসাম্বি-কথিত সুবিধাবাদই তার চরিত্রলক্ষণ। এখানে রাজশেখর যেন রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যাখ্যাই মেনে নিয়েছেন: 'গীতার মধ্যে কোনা একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে, তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে।' মুশকিল হচ্ছে, তিনি সেটাকে রবীন্দ্রনাথের মতো গীতার অপকর্ষ বা ন্যূনতা বলে ব্যাখ্যা করছেন না, বরং সেটাকেই ওর কাম্য বৈশিষ্ট্য বলে অনুমোদন করছেন। ৬) গীতায় ব্যক্ত জন্মান্তরবাদ, সূক্ষ্ম শরীর, দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতি ধারণা বেশ কিছু লোকের কাছে বিজ্ঞান-বিরোধী বলে অগ্রহণীয়। রাজশেখরও তাদেরই মধ্যে পড়েন বলে অনুমান করা যেতে পারে। ৭) গীতায় যে-নীতিশাস্ত্রের কথা বলা হয়েছে তা সর্বজনীন মানবতা-আদর্শের বিরোধী, যেহেতু তা সমাজের এক এক গোষ্ঠীর মানুষের প্রতি এক এক রকম মানদণ্ড প্রয়োগ করাটাকে ন্যায্য মনে করে। কিন্তু এটা তাঁর মতে প্রয়োজনীয় জিনিস।

লক্ষণীয়, অক্ষয় দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, অর্মত্য সেন এঁরা প্রত্যেকেই যে-নৈতিক সুবিধাবাদকে গীতার প্রধান দুর্বলতা বলে চিহ্নিত করেছেন, রাজশেখর সে প্রসঙ্গটা নিয়ে আদৌ ভাবিত নন। হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য এত বিপুল পরিমাণ নরহত্যাকে নৈতিক দিক থেকে সমর্থন করা যায় কি না, সেই প্রশ্নটা তিনি সরাসরি তোলেননি। বরং ঘুরপথে যেভাবে প্রসঙ্গটা তুলেছেন তাতে দেখা যায়, ওই ভয়ঙ্কর নরহত্যায় তাঁর অনুমোদনই ছিল:

> গীতায় শান্ত সহিষ্ণু মৃদু অহিংস হবার বহু উপদেশ আছে, কিন্তু ক্লীবের তুল্য পীড়ন সইতেও নিষেধ আছে। দুষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই গীতার উপলক্ষ্য। 'তস্মাৎ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব'— এই বাক্য বহু স্থলে গীতাধর্ম বিবৃতির সহিত জড়িত আছে। বিশ্বরূপ বর্ণনায় ব্রহ্মের ভয়াবহ সংহারমূর্তিই প্রকটিত হয়েছে। গীতাধর্ম শৌর্যবীর্যাদি পুরুষোচিত গুণের এবং সমাজরক্ষার্থ নিষ্ঠুরতারও পরিপন্থী নয়।[২৬]

সমাজরক্ষার্থ? যে-সমাজে সাধারণ মানুষের কাজ হল পরিচালকদের কথা বিনা প্রশ্নে মেনে চলা, সেই সমাজরক্ষার্থ নিষ্ঠুরতার প্রয়োগ অনুমোদন করছেন রাজশেখর! এই নিষ্ঠুরতার

ফল গোটা সমাজের পক্ষে কী ভয়াবহ হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করছেন অমর্ত্য সেন। গীতার এই অ-নৈতিক সুবিধাবাদে ব্যাহত হয়েই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন: 'সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে থাকাতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব উচ্চভাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরি খানিকটা না মিশে পারেনি।' কিন্তু রাজশেখর এ প্রসঙ্গে নির্বিকার।

তাই আধুনিক বিজ্ঞান-অবহিত মানুষের চোখে গীতার নানারকম ছিদ্র আবিষ্কার করার পরেও তাঁর মন্তব্য:

> কিন্তু সমস্ত অস্পষ্ট ও বিসংবাদী বিষয় বাদ দিলেও যা থাকে তা অতুলনীয়। বহু পূর্বে বহু প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে রচিত হলেও গীতায় সর্বকালের উপযোগী শ্রেষ্ঠ সাধনপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। [২৭]

কী সেই শ্রেষ্ঠ সাধনপদ্ধতি যা বহু পূর্বে প্রাচীন সংস্কারের মধে রচিত হলেও রাজশেখরের মতে আধুনিক যুগেও মূল্য হারায়নি? প্রথমত, চরম মোক্ষলাভের (সেটা কী, তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি) পথে যেসব 'সোপানের' কথা বলা হয়েছে, 'তার কোনও পঙ্‌ক্তিতে উঠতে পারলেও মানুষ কৃতার্থ হতে পারে— এও গীতার বক্তব্য।...সাধারণ লোকের গীতাপাঠের এও সার্থকতা।'[২৮] সেই 'সাধারণ লোক', যাদের 'গীতা মুখস্থ করিয়ে কোনও লাভ নেই' বলে তিনি মনে করেন! সর্বসাধারণের আত্মোন্নতির পথ বন্ধ করে দিয়ে এলিট অংশের আত্মোন্নতিতে নিযুক্ত সমাজকে নিশ্চয়ই সমদর্শী বলা যাবে না। বস্তুত সমদর্শী সমাজ গীতাকারের কাম্য তো নয়ই, কিন্তু— এইটাই দুঃখের কথা— রাজশেখরেরও কাম্য নয়। তাঁর মতে, গীতাকারের 'আদর্শ রাজর্ষি জনক। যিনি উপযুক্ত অধিকারী, তিনি সমাজে থেকে নিজ স্বভাব অনুযায়ী সমাজধর্ম পালন করেও এই সাধনা করতে পারেন।'[২৯] আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এর বিরুদ্ধে যা যা বলবার থাকতে পারে, সে সবই রাজশেখরের জানা। তিনি সেগুলোর ন্যায়তা পুরোপুরি অস্বীকার করেন না। তা সত্ত্বেও তাঁকে বলতে হয়, 'গীতায় সর্বকালের উপযোগী শ্রেষ্ঠ সাধনপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।' কোথাও কোনো একটা মানসিক অন্ধবিন্দু তাঁর ছিল, যা তাঁর মতো যুক্তিসন্ধ মানুষকেও অভিভূত করে ফেলত। সেই বদ্ধ ধারণার বাধ্যবাধকতার বশেই তিনি এই ধরণের আত্মখণ্ডন করেছেন। জীবৎকালে এটি প্রকাশ করেননি কি এইসব কারণেই?

উপসংহার

এ কথা ঠিক যে, গীতাভাষ্যের মধ্যে রাজশেখরের স্বভাবসুলভ সংশয়বাদী বৈজ্ঞানিক যুক্তিমত্তারও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তিনি যে চলতি পথের পথিক নন, তা পরিষ্কার। কিন্তু যখনই সমাজগঠনের কথা, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন অংশের মানুষের অধিকারের কথা উঠেছে, তখনই বেরিয়ে পড়েছে তাঁর অভিজাততান্ত্রিক রূপ।

হয়তো বিজ্ঞানকেও রাজশেখর অভিজাততান্ত্রিক অবস্থান থেকে গ্রহণ করেছিলেন। জনসাধারণ বিজ্ঞানের ফল ভোগ করবে ঠিকই, এমনকী দৈনন্দিন জীবনে কিছুটা

বিজ্ঞানমনস্কও হবে, কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার অধিকার শুধু অভিজাতদেরই থাকবে। এ এক ধরণের আধুনিক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, যাকে আধুনিক পরিভাষায় বুর্জোয়-গণতান্ত্রিক বুদ্ধিতন্ত্র বলতে পারি। কার্ল পপারের মধ্যেও এই জিনিসটাই দেখতে পাই। তিনিও বিজ্ঞানকে— প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে— খুব শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, এমনকী বিজ্ঞান-বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমাজিক দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক। তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে পৃথিবীতে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য ও শোষণ থাকবেই। তারই মধ্যে কিছু লোক যদি আশ মিটিয়ে লিখতে পড়তে পারে, তো সেই অনেক। 'পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ এবং উত্তর আমেরিকার সমাজ মেধাবী মানুষকে সেই সুযোগ দেয়, তাই তাঁর মতে সেই সমাজব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। তিনি চান এক নব ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, যেখানে তাঁর মতো পণ্ডিতেরা বিনা ব্যাঘাতে, সসম্মানে বিদ্যাচর্চা করতে পারবেন, বিনিময়ে শাসকদের জোগাবেন টিকে-থাকার যুক্তি।[৩০] জনসাধারণের কাজ হবে তাঁদের মতো 'জ্ঞানীদের' বলে দেওয়া পথ অনুসরণ করা। রাজশেখর বসুও কি সেই অভিজাততান্ত্রিক নব-ব্রাহ্মণ্যবাদেরই পথিক?

সূত্রনির্দেশ

১. অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,* দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৩), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ২৫৪

২. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* আনন্দ, কলকাতা, ৬:১২-১৩

৩. হরপ্রসাদ মিত্র, *রাজশেখর গ্রন্থাবলী,* প্রথম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৫

৪. Girindrasekhar Bose, *The Yoga Sutras,* The Indian Psycho-Analytical Society, no date, Calcutta, p.10

৫. ibid

৬. ibid, p.12

৭. op. cit.

৮. Amartya Sen, *The Argumentative Indian,* Allen Lane, Penguin, London, 2005, pp.3-5.

৯. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *মনীষী স্মরণে,* জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১৬৭

১০. রাজশেখর বসু, *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত,* এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা এগারো

১১. হরপ্রসাদ, ঐ

১২. ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৫-৯৬

১৩. এই ব্যাপারে গিরীন্দ্রশেখরের মত সম্পূর্ণ বিপরীত: 'আমার বিশ্বাস গীতা মহাভারতের অন্তর্গত হওয়ায় বুঝিতে হইবে তাহা জনসাধারণের জন্যই লিখিত হইয়াছে...।' দ্রষ্টব্য, রাজীব চৌধুরী, 'ত্রয়ী: শশিশেখর, রাজশেখর, গিরীন্দ্রশেখর', *জলার্ক* রাজশেখর বসু পরশুরাম বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা বইমেলা ২০০৭, পৃষ্ঠা ৭৬।

১৪. হরপ্রসাদ, পৃষ্ঠা ২০৯
১৫. ঐ
১৬. ঐ
১৭. ঐ
১৮. ঐ
১৯. ঐ, পৃষ্ঠা ২০৮
২০. ঐ, পৃষ্ঠা ২০৯
২১. দীপংকর বসু (সম্পা) *রাজশেখর প্রবন্ধাবলী*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা ৪০
২২. হরপ্রসাদ, পৃষ্ঠা ২০৫
২৩. ঐ
২৪. ঐ
২৫. ঐ, পৃষ্ঠা ২০৯
২৬. ঐ
২৭. ঐ
২৮. ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৬
২৯. ঐ, পৃষ্ঠা ২০৮
৩০. আশীষ লাহিড়ী, *বিজ্ঞানের দর্শন ও কাল পপার*, পাভলভ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা ৬৩

('জলার্ক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিবর্ধিত রূপ)

ভগবানের লেত্তি: আশীষ লাহিড়ী, গাঙচিল।